ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, February, 2026, Page No. 47-53
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2. specialissue.W.268

তারাশঙ্কর-রামকিঙ্কর-রঘুনাথ-ঋত্বিক: আধুনিকতার উপাদান- দেশ, দেশজ উপাদান ও মানুষ

গোবর্দ্ধন অধিকারী, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চোপড়া কমলা পাল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.12.2025; Accepted: 13.01.2026; Available online: 28.02.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Although four twentieth-century literary and artistic figures worked in different genres and forms, there was a remarkable similarity in their creative vision and thought. They placed indigenous elements at the very center of their creativity. Their modern intellectual pursuits were not shaped by reading foreign books or adopting foreign materials. Instead, the nation and its native cultural elements constituted the ultimate foundation of their artistic and literary practice.

Keywords: Literature, art, nation, indigenous elements, common people, life experience

সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিতে দেশজ উপাদানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অর্থাৎ যে ভাষা-সংস্কৃতিকে শিল্পী উপস্থাপন করতে চাইছেন তার গভীরে গিয়ে তাকে অনুসন্ধান বা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। দেশজ উপাদান এবং সেই সঙ্গে মানুষ; যা শিল্প-সাহিত্যের কাঁচামাল তাকে গুরুত্বের সঙ্গে অনুভব ও উপলব্ধি না করতে পারলে সেই শিল্প-সাহিত্য দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অন্তত পাঠক-দর্শকের মনে তা প্রভাব ফেলে না। এসব বাদ দিয়ে কোনো শিল্পী সাময়িক সাফল্য লাভ করতেই পারে। কিন্তু দীর্ঘকালে তা তলিয়ে যায় হারিয়ে যায়। কালের কোষ্ঠি বিচারে তা টিকে থাকে না। মনে রাখতে হবে ছাঁচের ঠাকুর আর শিল্পীর হাতে গড়া ঠাকুর দুইয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য থাকে। ছাঁচে গড়া ঠাকুর মানে কলের তৈরি ঠাকুরে শিল্পীর মনের মাধুরী থাকে না। তাই সেখানে বৈচিত্র্য থাকে না। তা দর্শক গ্রহণ করে না। যদিও ছাঁচে তৈরি ঠাকুর অনেক বেশি ত্রুটিহীন হয়ে থাকে। আর শিল্পী নিজের হাতে যে প্রতিমা বা কোনো ভাস্কর্য তৈরি করে সেখানে তিনি বিভিন্ন সময়ে বৈচিত্র্য আনতে পারেন স্বাধীনভাবে।

মূল কথা হল যে ভাষা-সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে সাহিত্য-শিল্প রচিত হচ্ছে তাকে ভালো করে জানতে হবে। অর্থাৎ আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যকে জানতে হবে এবং তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। সেইসঙ্গে জানতে হবে বুঝতে হবে মানুষকে। যে মানুষকে আমরা সাহিত্যে-শিল্পে স্থান দিতে চাইছি তাকে মমতা দিয়ে অনুভব করতে হবে। তাকে সহানুভূতির সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। অর্থাৎ চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে বই পড়ে মানুষকে জেনে শিল্প-সাহিত্য রচনা করলে তার মধ্যে কৃত্রিমতা আসবে। অনেকটা কলের তৈরি জিনিস হবে। যা পাঠক-দর্শকের চিত্ত জয় করতে ব্যর্থ হবে। আমাদের এই মতের সপক্ষে আমরা পেয়েছি সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক, শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ, শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামীকে। এঁদের বাইরেও অনেকেই আছেন যাঁরা এই ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন বা আছেন। মনে পড়ে বিশ

শতকের ত্রিশের দশকে একদল সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁরা বিদেশি সাহিত্য পাঠ করে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা আনতে চেয়েছিলেন। কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে আবির্ভূত সেইসব সাহিত্যিকদের অধিকাংশই পরবর্তীকালে আর টিকে থাকেননি। হারিয়ে গেছেন। কারণ তাঁদের সাহিত্যচর্চার শিকড় ছিল মাটির উপরে উপরে। মাটির গভীরে সেই শিকড় প্রবেশ করেনি। কেবলমাত্র ন্যুট হামসুন, গোর্কি ইত্যাদি বিদেশি সাহিত্যিকের সাহিত্য পাঠ করে দেশের মানুষকে না জেনে না বুঝে সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে তাঁরা দীর্ঘকালে টিকে থাকতে পারেননি। তবে হ্যাঁ তাঁদের গুরুত্ব অবশ্যই আছে। যে কারণে বুদ্ধদেব বসু 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন 'ভাবীকালে এঁদের রচনা যে-রকমভাবেই কীটদষ্ট হোক-না' ইতিহাস তিরিশের দশকের এই কবি-শিল্পীদের মনে রাখবে।[১] এখন প্রশ্ন উঠতে পারে কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় দেশজ উপাদান বহুল পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তিনি হারিয়ে গেলেন কেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের মতো "এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না-জন্মিবার যো নাই-জন্মিয়া কাজ নাই।"[২] হ্যাঁ ঈশ্বর গুপ্ত একালে আর সেভাবে চর্চিত হন না। তাঁর রচনায় প্রবলভাবে দেশজ উপাদান থাকলেও তাকে কীভাবে উপস্থাপন করতে হয় বা তার মধ্যে উচ্চ কোনো ভাবকে তিনি যুক্ত করতে পারেননি। আম জনতার দরবারে তিনি একালে বিস্মৃত হলেও তাঁর কয়েকটি প্রবাদ কিন্তু একালেও বেশ চর্চিত হয়। যেমন- "রেতে মশা দিনে মাছি,/এই তাড়ুয়ে কল্‌কেতায় আছি।"[৩] ঈশ্বর গুপ্ত দেশজ কবি হিসেবে আজও স্বীকৃতি এবং সম্মান পেয়ে থাকেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত পাশ্চাত্যে বিখ্যাত কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেতে প্রচুর বিদেশি সাহিত্য পাঠ করেছিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের কাছে বিখ্যাত হয়ে রইলেন দেশজ উপাদান নিয়ে সাহিত্য চর্চা করার জন্য। তিনি পাশ্চাত্য দার্শনিক ভাবনাকে দেশজ উপাদানের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করে বাঙালির হৃদয়ে চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হল আমরা বর্তমানের চরম ডিজিটাল দুনিয়ায় দাঁড়িয়ে এসব কাসুন্দি কেন ঘাঁটছি। কারণ এখন মানুষকে পর্যবেক্ষণ না করেই দেশকে না জেনেই ঘরে বসেই সাহিত্য রচিত হয়ে যাচ্ছে। তারপরে আক্ষেপ শুনতে হয় বাংলা সাহিত্যের বাজারে এখনও মৃত লেখকদেরই রবরবা। সাহিত্য-শিল্পের মধ্যে পাঠক-দর্শক কৃত্রিমতা পছন্দ করে না। আমাদের সহৃদয়হৃদয়সংবেদী পাঠক-দর্শক সজীবতা পছন্দ করে। চিত্তের আরাম অনুভব করতে চায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত গল্প-উপন্যাসেই তুলে ধরেছিলেন তাঁর চোখে দেখা চরিত্রদের। লাভপুর এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলের বিভিন্ন ঘটনা, প্রথা, সংস্কার-কুসংস্কার ইত্যাদিকে সজীব করে স্থান দিয়েছিলেন তাঁর সাহিত্যে। নিজের চোখে দেখেই 'ডাইনী' গল্প লিখেছিলেন। স্বর্ণ ডাইনী তাঁর চোখে দেখা। অনেকে সে সময় এই গল্প পাঠ করে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে বিদেশি কোনো গল্প পাঠ করে তা লেখা। কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শংসাপত্র দিয়েছিলেন যে 'ডাইনী' একেবারে দেশিয় জিনিস। কলকাতা কেন্দ্রিক বিদেশি সাহিত্য পাঠ করা সাহিত্যিকরা সেদিন তা বিশ্বাস করেননি। 'রসকলি', 'রাইকমল' গল্পের বৈষ্ণবী তাঁর কাছারির কাছে আখড়াতে থাকত। নাম কমলিনী বৈষ্ণবী। সেই কমলিনীকে তিনি যেমন চোখে দেখেছেন তেমন করেই সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। 'কবি' উপন্যাসের নিতাই কবিয়াল বা যে দেহজীবীদের কথা তিনি লিখেছেন এসব সেকালে এভাবেই জীবন্ত ছিল। 'হাঁসুলীবাকের উপকথা'র মতো উপন্যাস জীবনকে উপলব্ধি না করলে বা কালারুদ্র সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে লেখা সম্ভব নয়। এইসব দেশজ উপাদান ও মানুষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পাশাপাশি তারাশঙ্কর 'সাহিত্যিকের দায়িত্ব' প্রবন্ধে জানিয়েছেন "সাহিত্যিক ও সাহিত্য কারও মুখাপেক্ষী নয়- না রাষ্ট্রের না সমাজের না ব্যক্তির। সে মুখাপেক্ষী সত্যের, সতের, ন্যায়ের।"[৪] অর্থাৎ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সত্যের বাণীকে তুলে ধরতে হবে। তারাশঙ্করের এই অবস্থান থেকেই

সেকালে কমিউনিস্টদের সঙ্গে বিরোধ বাধে। পার্টি লাইনকে স্বীকার করে উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য রচনাকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। এই কারণে তাঁর একই উপন্যাসের একই ব্যক্তি আলোচনা করেন দুরকমভাবে। একবার প্রশংসা করেন এবং লেখক দলের কিছু সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করলে মার্ক্সবাদে দীক্ষিত ওই একই আলোচক আবার সমালোচনা করেন।

ঠিক এই ভাবনা থেকেই আমরা পেয়ে যায় চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটককে। ঋত্বিক নাটকে-চলচ্চিত্রে দেশের মানুষের কথা বলতে চেয়েছেন। দেশের মানুষের সমস্যা সাহিত্য-শিল্পের মাধ্যমে তুলে ধরার কথা বলেছেন বারংবার। 'আমি মনে করি slogan mongering করে, বড়-বড় বাতেলা করে সমাধান দেখিয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়। আমার নিজের ধারণা এদেশে কেউ সে-ভাবে সমস্যাগুলোকে ধরার চেষ্টা করেনি। আমি যদি সেটা করতে পারি, লোকের সামনে ছুঁড়ে ফেলতে পারি যে এই হল তোমাদের সমস্যা, এখন ভাবো- What is to be done- তা হলেই যথেষ্ট। আমার মনে হয় এটাই আমার কাজ'।[৫] অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সমস্যা সাহিত্যের মাধ্যমে বা শিল্পের মাধ্যমে তুলে ধরে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া শিল্পী-সাহিত্যিকের কাজ। সেই সমস্যা সমাধানের পথ ভাবতে হবে সাধারণ মানুষকেই। ভাবা প্র্যাকটিস করতে হবে।

ঋত্বিক ঘটক মানুষকে জাগিয়ে তোলার জন্যই প্রথমে গল্প, তারপর নাটক এবং শেষে চলচ্চিত্রে পদার্পণ করেন। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সবথেকে বেশি লোককে 'hit' করা যায় তাই তিনি এটাই বেছে নেন। এর থেকে ভালো কোনো মাধ্যম পেলে তিনি চলচ্চিত্রকেও ত্যাগ করবেন জানান। মোদ্দা কথা হল তিনি দেশের মানুষ এবং তাদের সমস্যাকেই নাটকে-চলচ্চিত্রে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তিনি এও বলেছেন-

> "আমি বিশ্বাস করি না যে, আমার কোনো শিল্পকর্ম করার অধিকার আছে, যদি না আমার দেশের এই সংকটকে কোনো-না-কোনোদিক থেকে উদ্‌ঘাটিত করে তুলতে পারি। আমার বেশিরভাগ ছবিই সেই সংকটকে ধরার চেষ্টা মাত্র।"[৬]

অনেকে উপযুক্ত বিষয় না পেয়ে আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। কিন্তু তা বেশিদিন চলে না। টিকে থাকে না। 'সাম্প্রতিক নাটকের একটি সমস্যা' নামক লেখায় ঋত্বিক

> "আমাদের অধিকাংশ সাম্প্রতিক নাটকে মানবজীবন থকে দূরে সরে যাওয়ার ব্যাপার ঘটছে। প্রতিটি শিল্পীর কাছে মানুষের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে যাবার একটা প্রশ্ন আছে।"[৭]

মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না বলেই আঙ্গিকের কলাকৌশলের উপর বেশি জোর দিতে হয়। বিষয় নির্বাচনের মধ্য দিয়েই আঙ্গিক নির্ধারিত হয়ে যায়। এরফলে শেষপর্যন্ত যা হয় বক্তব্য বিষয়ের থেকেও আনুসঙ্গিক বড়ো হয়ে ওঠে। দর্শক-শ্রোতার মন জয়ে ব্যর্থ হয় আঙ্গিকসর্বস্ব শিল্পকলা। আঙ্গিকের এই বাড়বাড়ন্ত পাঠক-দর্শককে অভিভূত করতে পারে, কিন্তু পরক্ষণেই তা দূর হয়ে যায়। তারপরে কী পড়ে থাকে? গভীর শূন্যতা। ঋত্বিক শিল্পকর্ম বিষয়ে বলতে গিয়ে বারবার বলেছেন নাটক-চলচ্চিত্র তিনি করেছেন মানুষকে ভাবানোর জন্য। নাটক বা চলচ্চিত্রের শেষে পাঠক যেন কিছু একটা ভাবতে বাধ্য হয়। তবেই সেই শিল্পকর্ম সফল। দেশের মানুষের কথা সমস্যার কথা দেশজ উপাদান নিয়ে শিল্পের মধ্যে প্রকাশ করে মানুষকে ভাবাতে হবে তারই দেশ বা সমাজের সমস্যাটা কোথায়। সমস্যার সমাধান দেওয়া শিল্পীর কাজ নয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সেকালের সমালোচকরা প্রায়ই অভিযোগ করতেন তিনি সমাজের সমস্যা দেখিয়েছেন, কিন্তু সমস্যার সমাধান দেননি। সমস্যার সমাধান করা শিল্পীর কাজ নয়। তা করতে গেলে শিল্প উদ্দেশ্যমূলক প্রচারধর্মী হয়ে পড়ে।

ঠিক এই জায়গা থেকেই আমরা যেতে পারি শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজের কাছে। তিনি তো সম্পূর্ণ দেশীয় মানুষ। দেশজ উপাদান থেকেই কোনোরকম প্রশিক্ষণ ছাড়াই প্রথম রঙ বানাতে শিখেছিলেন। প্রকৃতির কাছ থেকে অনবরত শিখেছেন। গাছের পাতা থেকে নিজে রঙ বানিয়েছেন, শান্তিনিকেতনে আচার্য নন্দলাল বসুর সান্নিধ্যে আসার আগেই। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁকে বাঁকুড়ার গ্রাম থেকে নন্দলালের কাছে নিয়ে গেলে জল রঙ আর তেল রঙের কিছু ছবি দেখে বলেছিলেন "এখানে এসেছ কেন? তোমার তো শেখা হয়ে গেছে, আর কী শিখবে?",[৮] 'এই তো হয়ে গেছে, আর কেন?' অর্থাৎ রামকিঙ্কর তখনই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে ফেলেছিলেন। তবুও দুই-তিন বছর শান্তিনিকেতনে থাকতে বললেন। এই হচ্ছে আসল শিক্ষা। প্রকৃতিই তো আমাদের প্রথম শিক্ষক। এসব আজকের দিনে পাগলের প্রলাপ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতিকে নিজের দেশকে মাটিকে না জেনে প্রকৃত শিল্পী হওয়া খুব মুস্কিল। হচ্ছে না কি? অবশ্যই হচ্ছে। কিন্তু টিকে থাকার লড়াইয়ে হারিয়ে যায় সে সব। গভীর পর্যবেক্ষণ আর অনুধাবন না থাকলে প্রকৃত শিল্পী হওয়া যায় না।

রামকিঙ্কর যা শিখেছিলেন নিজের চেষ্টায়। চেষ্টা না থাকলে কোনো শিল্পকলাতেই তো সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। শান্তিনিকেতনে কলাভবনের রবীন্দ্রনাথ নির্দেশিত শিক্ষাপদ্ধতিও ছিল স্ব-শিক্ষার। এক সাক্ষাৎকারে রামকিঙ্কর জানিয়েছেন-

> "রবীন্দ্রনাথ নন্দলালকে বলেছিলেন, কারওকে কিছু শিখিও না, যে যা করতে চায় করুক। 'নন্দলাল নিজেও নিজের কাজ করুক', কবি বলেছিলেন, 'ছাত্ররা তা-ই দেখে শিখবে, প্রেরণা পাবে'।"[৯]

একালের কোনো আর্ট স্কুলে ছেলে-মেয়েকে কোনো শিক্ষক যদি এই ব্যবস্থায় শেখাতে যায় তাহলে সেই পাঠশালা বন্ধ হতে বেশিদিন সময় লাগবে না। প্রতিযোগিতার বাজারে এখন সবই খুব তাড়াতাড়ি শেখা চায়। শুধু তাড়াতাড়ি শিখলে হবে না। বাজারে তাড়াতাড়ি সুনাম অর্জন করতে হবে। এসব করতে গিয়ে আমাদের এমএ ক্লাসের এক মাস্টারমশাই বলতেন গুরুমারা বিদ্যের চর্চা চলছে।

বর্ষায় মোরামের রাস্তা ভিজে ধুয়ে যাওয়ার পর নীলরঙের এক ধরনের মাটি বের হয়। সেই মাটি দিয়েই রামকিঙ্কর প্রথম কিছু বানান। আর গ্রামে থাকতে রঙ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন গাছের পাতার রস, বাটনা-বাটা শিলের হলুদ, মেয়েদের আলতা, মুড়ি ভাজার পর খোলায় লেগে থাকা ভুষোকালি। মনে পড়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছেলেবেলায়' বলেছিলেন সেকালে শিশুদের খেলার উপকরণ থাকত খুবই কম। কিন্তু সেই স্বল্প উপাদান দিয়েই তারা কল্পনার জগতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে বেড়াত। শিল্পী রামকিঙ্কর বাল্যকালেই প্রকৃতি থেকে উপাদান নিয়ে প্রকৃতির কাছ থেকে পাঠ নিয়ে ভবিষ্যতের শিল্পী হবার সলতে পাকিয়ে ফেলেছিলেন। সুতরাং প্রকৃতির কাছ থেকে পাঠ নিয়ে দেশকে দেশের মানুষকে পর্যবেক্ষণ করেই প্রকৃত শিল্পসৃষ্টি সম্ভব। যা সৃষ্টি হবে তা মনের আনন্দেই সৃষ্টি হবে। উপাদান ও আঙ্গিকের প্রাচুর্য যেকোনো শিল্পকেই তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে বাধা দেয়। কৃত্রিমতা সেখানে এসে ভিড় করে।

রামকিঙ্কর একবার রবীন্দ্রনাথের একটি প্রতিকৃতি বা মূর্তি গড়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ভয় ছিল। কারণ বিদেশে তিনি দেখেছেন মূর্তি গড়িয়েরা জ্যান্ত মানুষকে ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়ে রেখে যন্ত্রপাতি দিয়ে নাক-মুখ মেপে কাজ করে। এই অবিকল ছাঁচ তৈরিতে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল। রামকিঙ্কর বললেন-

> "আমার কিছু মাপার দরকার নেই, আপনি নিজের কাজ করবেন, আমি পাশ থেকে আমার কাজ করে যাব।"[১০]

অর্থাৎ শিল্পী স্বাধীনভাবে তার কাজ করবেন। অত মাপজোক করে কোনোকিছু নির্মাণ হয়, সৃষ্টি হয় না।শিল্প হচ্ছে শিল্পী অহৈতুকী আনন্দের ফসল। কেবলমাত্র সৌন্দর্যসৃষ্টিই তার লক্ষ্য। আর কবি তো অনেক আগেই বলেছেন সত্যই সৌন্দর্য। আর সত্যই শিল্পের আদর্শ। কীট্স অনেক আগেই 'Grecian Urn' কবিতায় বলে গিয়েছেন- 'Beauty is truth, truth is beauty.'

ঋত্বিক গণমানুষের কথা শিল্পের মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন, যে কারণে তিনি গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। রামকিঙ্করও বলেছেন শিল্পী হিসেবে "সমাজের প্রতি সব সময়ে কিছু-না-কিছু দায়িত্ব বর্তে যায়ই।"[১১] তাই দাঙ্গা, দেশভাগ, যুদ্ধ ইত্যাদি শিল্পীকে প্রভাবিত করবেই। তারাশঙ্করও তাঁর 'মন্বন্তর ও সাহিত্য' প্রবন্ধে সাহিত্যের উদ্দেশ্য বলতে বোঝাতে চেয়েছেন 'সর্বজনকল্যাণকর' বিষয়কেই সর্বাগ্রে সাহিত্যে স্থান দিতে হবে। তিনি সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের দেশের মানুষ যাতে সমগতিতে ছুটে চলতে পারে এবং নবজীবন আসে তা তিনি বারবার চেয়েছেন। আর তাই যে বিপ্লব আনে নবজীবন তাকে তিনি সাহিত্যে স্থান দিতে চেয়েছেন। কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশ মেনে সাহিত্য রচনার বিরোধী ছিলেন তারাশঙ্কর থেকে ঋত্বিক দু'জনেই। কিন্তু মানুষের কথা বলতে হবে, জীবনের কথা বলতে হবে- এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ-রামকিঙ্কর থেকে তারাশঙ্কর-ঋত্বিক সকলেই একমত। কারণ সাহিত্য-শিল্প তো মানুষের জন্যই।

রঘুনাথ গোস্বামী একজন গ্রাফিক শিল্পী ছিলেন। কমার্সিয়াল শিল্পী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন মাধ্যম নিয়ে কাজ করেছেন। গ্রন্থের প্রচ্ছদ থেকে পুতুল নাচ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন। বিদেশে সেকালে অনুষ্ঠিত ভারত উৎসবের পরিকল্পনা ও তা রূপায়ণ করা তাঁরই দায়িত্ব ছিল। এইসব ক্ষেত্রেই তিনি দেশজ বিভিন্ন উপাদানকে বারবার স্থান দিয়েছেন। প্যারিস ইত্যাদি স্থানে ভারত উৎসবের জন্য তিনি ভারত থেকে দেশজ বিভিন্ন উপকরণ বড়ো বড়ো কনটেনারে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। দেশের যে অঞ্চলের শিল্পীরা যে কাজটি ভালো করতেন তাদের দিয়েই সেই কাজটি করিয়ে নিতেন। কোনো কৃত্রিমতা সেখানে ছিল না। একই কারণে আলোক শিল্পী তাপস সেনকে নিয়ে যেতেন আলোর কাজ করার জন্য। রঘুনাথের প্রতিটা কাজেই দেশজ উপাদানকে গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছিল।

পুতুল নাচ; যা একান্তভাবেই আমাদের দেশীয় এবং লোকজ একটি উপাদান তা দিয়ে তিনি যেমন নাটক করেছেন, তেমনি তা দিয়ে তিনি অ্যানিমেশনের বিকল্প একটি মাধ্যম তৈরি করতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ ইচ্ছা থাকলে এবং একটু পড়াশোনা থাকলে, দেশজ ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকলে আমাদের দেশীয় উপাদানের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট শিল্প তৈরি সম্ভব। আজকের দিনে যখন অ্যানিমেশন ফিল্ম তৈরি হচ্ছে যেখানে জীবনের থেকে কলা-কৌশলের অতিরিক্ত ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। মনে হয় তা যেন জীবনবিযুক্ত একটি শিল্প। আর জীবনবিযুক্ত শিল্পের কলা-কৌশল আমাদের সাময়িক মুগ্ধ করতে পারে, আমাদের কিংকর্তব্যবিমূঢ় করতে পারে। কিন্তু ওইটুকুই। পরক্ষণেই যখন আমাদের চক্ষু থেকে মায়া অঞ্জন দূর হয়ে যায় তখন আমাদের শূন্য হাতেই ফিরতে হয়। আসলে যে ব্যক্তি অ্যানিমেশনের সিনেমা বানাচ্ছেন তাকে কিছু দৃশ্য তৈরি করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সামগ্রিক গল্পের উপর তার কোনো হাত নেই। সামগ্রিকতার উপর বা Completeness বিষয়টা এখানে উপেক্ষিতই থেকে যায়। ঋত্বিক এ বিষয়ে 'ফিল্ম ডিরেক্টর' ও 'ক্রিয়েটর' এরকম দুটো ভাগ করেছেন। ফিল্ম ডিরেক্টর একজনের গল্প কেনে, একজনকে দিয়ে দৃশ্যগুলো লেখায় এবং নিজে ডিরেকশন দেয়। আর ঋত্বিক নিজেকে বলেছেন 'ক্রিয়েটর'। কারণ গল্প থেকে সাউণ্ড, এডিটিং ইত্যাদি সবকিছু নিজেই করেন। এক্ষেত্রে যে ফিল্মটি তৈরি হল তা সম্পূর্ণ ওই ডিরেক্টরের সন্তান।

অ্যানিমেশন শিল্পী শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাইরের আলো প্রবেশ না-করা অফিসে বসে কম্পিউটারে স্থির কিছু চিত্রকে গতি দান করে বা সচল করে তোলে। বাইরের জীবনের সঙ্গে ওই শিল্পীর কোনো সম্পর্ক

অধিকাংশক্ষেত্রেই থাকে না। যক্ষপুরীর মতো অফিসে বসে সারাদিন কম্পিউটারে কাজ করে রাত্রে ক্লান্ত শরীর বিছানায় ফেলে দিতে হয়। হ্যাঁ সবাই এই পথে চলে না। কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রে এরকমই হয়ে থাকে। ফলে সে যন্ত্রের মধ্য দিয়ে যন্ত্রের মতো কিছু তৈরি করে। তাকে সৃষ্টি বলা যায়? মানুষকে বাদ দিয়ে সার্থক সাহিত্য-শিল্প সম্ভব নয়। রঘুনাথ গোস্বামী এ বিষয়ে 'ভারতীয় শিল্পকলায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিফলন' প্রবন্ধে বলেছেন-

> "... শিল্পকলা কোনও অপ্রয়োজনীয় সখের বস্তুবাহুল্য, জীবনের একটা অনাবশ্যক বা অপ্রধান বিষয় নয়। কোটের বোতাম ঘরে গুঁজে রাখা গোলাপফুলের মতো শিল্পকলাকে একধরনের শৌখিন কিছু ভেবে আমাদের অনুকম্পা করার কোনও কারণ নেই।"[১২]

এখানে আর একটি বিষয় বলা প্রয়োজন- শিল্পী ও কারিগর। যিনি প্রতিমার সবকিছুই নিজের হাতে করেন মনের মাধুরী মিশিয়ে তিনি হলেন শিল্পী। কিন্তু যে যন্ত্রের মতো কেবলমাত্র প্রতিমার চুল ঠিক করে বা কেবলমাত্র প্রতিমার রঙ করে তারা হল কারিগর। অর্থাৎ কারিগর ছাঁচের জিনিস তৈরি করে। শিল্পীর প্রতিটি দুর্গা মূর্তিই একইরকম, কিন্তু তবুও তাদের মধ্যে প্রত্যেকটিরই স্বতন্ত্র রূপ থাকে। কারিগর জিনিস তৈরি করে, সৃষ্টি করতে পারে না।

সাহিত্য-শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে দেশজ উপাদান এবং মানুষই হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সাহিত্য সমাজের কথা তুলে ধরবে। সমাজকে সার্থকভাবে তুলে ধুরতে হলে সর্বাগ্রে সমাজকে জানা প্রয়োজন। সমাজকে জানার ক্ষেত্রেই বর্তমানে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। যতদিন যাচ্ছে মানুষ সমাজ-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। মানুষে মানুষে কথা বলা এখন বারণ। মোবাইল স্ক্রিনেই এখন সবাই কথা বলে। উন্নয়নের ধাক্কায় একদিকে আমাদের খেলার মাঠ ক্রমাগত যখন ছিনতাই হয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মোবাইলের স্ক্রিন আমাদের হাতে চলে এসেছে খেলার মাঠের বিকল্প হিসেবে। বাল্য-কৈশোর এখন খেলার মাঠে বড়ো হয় না। ফলত একে-অপরকে জানার রাস্তা এখন বন্ধ। ফলত জীবনের অভিজ্ঞতা, জীবনকে পর্যবেক্ষণ করা এখন বাতুলতামাত্র। ফলত ছাঁচেগড়া সাহিত্য সৃষ্টি হওয়াই এখন স্বাভাবিক। যতদিন যাবে মানুষের সমাজ-বিচ্ছিন্নতা আরও বাড়বে। ফলত সাহিত্যে-শিল্পে কৃত্রিমতা আরও দিনদিন চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকবে।

এখন প্রশ্ন উঠবে আমরা কি আধুনিকতার বিরুদ্ধে? আমরা কি নতুনকে স্বাগত জানাতে দ্বিধাবোধ করছি? না। আমাদের ভাবনার বিষয় মানুষ এবং দেশজ উপাদান। মানুষের জন্যই তো শিল্প-সাহিত্যের জন্ম। তাহলে সেই মানুষকে উপেক্ষা করে সৃষ্টি কীভাবে সম্ভব! উপাদানের স্বল্পতা ও জীবনকে যথাযথ দেখার অভিজ্ঞতা না থাকাতেই ফর্মুলা মেনে সাহিত্য সৃষ্টি হয়। ফর্মুলা মেনে শিল্প তৈরি হয়। ফলত সজীবতা থাকে না সাহিত্য-শিল্পে। বিঘ্নিত হয় চরৈবেতি মন্ত্র। আমাদের যা কিছু সার্থক সৃষ্টি সবই যেন উনিশ-বিশ শতকেই হয়ে গেছে। সাহিত্য-শিল্পকলা সর্বত্রই বিগত কালেই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হয়ে গেছে। যত সময় এগিয়েছে আধুনিকতা এসেছে আমরা ততই জীবনকে দূরে ঠেলেছি সাহিত্য-শিল্পকলা থেকে। তাই সেকালে শিক্ষার হার যথেষ্ট কম থাকা সত্ত্বেও বই বিক্রির হার ছিল ভালোই। যার অন্যতম প্রমাণ সেকালে কলেজ স্ট্রিট কেন্দ্রিক প্রকাশনীগুলির বইয়ের সংস্করণ ৩০০ বা ৫০০ কপিতে হতো না। ১১০০ টি বই বিক্রি হলে নতুন সংস্করণ হতো বা পুনর্মুদ্রণ করা হতো। এখন আবার এসে গেছে প্রিন্ট অন ডিমান্ড। অর্থাৎ যেমন চাহিদা তেমন ছাপাব। দরকার হলে পঞ্চাশটা বই, আবার দরকার হলে দশটা বইও ছাপানো যাবে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় শিক্ষার হার যেভাবে বৃদ্ধি পেল সেভাবে গল্প-উপন্যাস পড়ার বা সাহিত্য পাঠ বাড়ল না। অবশ্য সাহিত্য পাঠ না বাড়ার পিছনে বহুবিধ কারণ আছে। তাই কেবলমাত্র লেখকদের দোষ দেওয়া যাবে না। কিন্তু পুরোনো লেখকরা এখনও জোর ব্যাটিং করে চলেছেন। যা প্রমাণ করে বর্তমানের লেখকরা বিষয় হোক বা

উপস্থাপনরীতির কারণে বৃহৎ পাঠকের মন জয় করতে ব্যর্থ হচ্ছে।আমাদের অভিযোগ তারাশঙ্কর থেকে ঋত্বিক ঘটক সাহিত্য-শিল্পের চর্চায় যে পথের কথা বলে গেছেন সেই পথ থেকে একালের সাহিত্যিক-শিল্পীরা বিচ্যুত হয়েছেন বলেই আজ এই অবস্থা।মানুষকে মানুষের সঙ্গে মিশে জানার অভাব এবং দেশকে না জেনে সাহিত্য-শিল্প সৃষ্টিতে একালের সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পীদের আসার ফলে আঙ্গিক নিয়ে বড়ো চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়ে চলেছে। যার ফলে একালে সৃষ্টির থেকে নির্মাণ বেশি হয়ে চলেছে। হ্যাঁ এ তো ঠিকই সব সাহিত্যিক-চিত্রশিল্পী-চলচ্চিত্র পরিচালক এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন। সেটাই এখনও আশার আলো দেখায়।শম্ভু মিত্রের একটা কথা দিয়ে এই আলোচনার আপাতত সমাপ্ত টানা যাক। 'আজকের বাঙলা নাটকের অবস্থা ও ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন-

> "কিন্তু শিল্প তো নিছক প্রমোদের বা আপ্তবাক্যের আফিম হিসেবে ব্যবহৃত হবার নয়। শিল্প মানুষের বোধের একটা হাতিয়ার। ... শিল্পও তেমনি মানুষকে বোঝবার, মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক বোঝবার একটা অস্ত্র।"[১৩]

দেশ এবং দেশের মানুষকে উপেক্ষা করে সার্থক সৃষ্টি সম্ভব নয়।

তথ্যসূত্র:

১. বসু, বুদ্ধদেব। রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক, সাহিত্যচর্চা। সিগনেট প্রেস, ১৩৬১, কলকাতা, পৃ. ১৫০।
২. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। ঈশ্বরগুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব, বঙ্কিম রচনাবলী (প্রবন্ধ)। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ১০৬০।
৩. তদেব, পৃ. ১০৬৩।
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। সাহিত্যিকের দায়িত্ব, অগ্রন্থিত রচনাবলী। মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনী, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ২২২।
৫. ঘটক, ঋত্বিক। নিজের পায়ে নিজের পথে: এক কথা-কোলাজ। বইপত্তর, ২০২৪, কলকাতা, পৃ. ৩১।
৬. ঘটক, ঋত্বিক। চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরো কিছু। নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১৫৩।
৭. তদেব, পৃ. ১৯।
৮. বেইজ, রামকিঙ্কর। আমি চাক্ষিক, রূপকার মাত্র। বইপত্তর, ২০২৪, কলকাতা, পৃ. ২২।
৯. তদেব।
১০. তদেব, পৃ. ৬৩।
১১. তদেব, পৃ. ৯০।
১২. গোস্বামী, রঘুনাথ। ভারতীয় শিল্পকলায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিফলন, রঘুনাথ গোস্বামী: গদ্যসংগ্রহ। গাঙচিল, ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৩১৩।
১৩. মিত্র, শম্ভু। প্রসঙ্গ: নাট্য। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭১, কলকাতা, পৃ ১০৭।